সোনালী আভা ও একটি চিঠি

মোঃ আবদুল খালেক

সম্পর্কের ধারা ধরেই আমরা মনের কথা বলি । সব সময়ে সব কথা সবাকে বলা যায় না। এমনও অনেক কথা আছে যা কাউকেই বলা যায় না। যা ধরে রাখতে হয় অতি গোপনে, চাপা কান্না দিয়ে ঢেকে। মুখের হাসি দিয়ে লুকাতে হয়- চাপা কান্নার এসব শব্দ গুলোকে। ১৯৭১ সালের ডাইরীর কিছু পাতা আমি মাঝে মাঝে পড়ি। গোপনে পড়ি। পড়তে পড়তে উঠে গিয়ে কখনও চোখ ধুঁয়ে আসি। কেউ যেন বুঝতে না পারে চশমার আড়ালে আমি কেঁদেছি। ডাইরীর পাতায় পাতায় স্বাধীনতা যুদ্ধ কালীন মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়ের কাহিনী, বিবিসির মন্তব্য,কলিকাতা বেতারের সংবাদ সংক্ষেপ, কোন কোন পাতায় কিছু কিছু কবিতা, গান এবং আরো আছে অন্য এক জনের নাম। তার সাথে কিছু স্মৃতি কথা। যার কথা আমি আজও কাউকে বলিনি। কেন যেন কাউকে বলতে পারিনি। তার নাম জাহান।

৭০'এর শেষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ক্লাসে ভর্তি কালীন সময় জাহান এর সাথে আমার প্রথম পরিচয়। ১৯৭১ সালের গোড়ার দিকে প্রথম বর্ষের ক্লাশ শুরু হয়ে যায়। আমরা একই বিভাগের না হলেও একই ভবনে আমাদের ক্লাশ হোত। প্রথম পরিচয়ের রেশ ধরে ওর সাথে আমার আলাপের গভীরতা যেন একটু বেশী গোলাপী স্বপ্নের মুকুল হয়ে বেড়ে উঠতে ছিল। কোন কিছু চিন্তার শেষে বা পড়ার টেবিলের মাঝপথে , নিজের অজান্তেই ওর নাম এসে যেত আমার মনের চোখে। কিছু লিখতে যেতে দেখতাম ওর নাম এসে গেছে কলমের আঁচড়ে। হাঁটতে হাঁটতে এক সময়ে দেখতাম আমি কখন পৌছে গেছি ওর আবাসিক হলের দ্বারে। এসব কথা কোন সময়ে আমি ওকে বলতে পারিনি। ওর সাথে দেখা হলে মনে হোত ও যেন আমার জন্যই অপেক্ষা করতেছিল। তারপর একটি বকুল তলায় সারা বিকাল আমাদের ঠিকানা। পাইন বৃক্ষের পাশ গেয়ে, পাহাড়ি ঢালে মেঘ ছুঁয়ে ছুঁয়ে আমরা দুজনে কখন হারিয়ে যেতাম আকাশের শূন্যতায়-কেউ কাছে নেই। ওর সোনালী চেহারার আভায় প্রতিফলিত হোত আমার চোখ। ওর জাহান নাম টা ছোট করে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম-'জান ,তুমি এত সোনার মত কেন? তুমি কি সোনার দানাপানি খাও?'জাহান মৃদু হেসে বিনয় কণ্ঠে বলতেছিল-'আমার দাদীজানের কাছে শুনেছি,আমাদের পুর্ব পূরুষরা এক সময় এলাহাবাদে মুদ্রার ব্যবসা করত। দেশ বিভাগের বেশ কয়েক বছর পুর্বে রেল বিভাগে চাকুরি নিয়ে তারা পুর্ব বাংলায় চলে আসেন। বাবার বদলী তখন শান্তাহার। বাবা মা' র বিবাহের কয়েক বছর পরও, যখন আমরা ভাইবোন হচ্ছিলাম না, তখন দাদীজান ভীষন উৎকণ্ঠায় পড়েছিলেন। দোয়া দরুদ ,ঝাড় ফুক, কবিরাজ বৈদ্যের সাহসী চেষ্ঠায় একদিন আমি সকলের চোখের নূর হয়ে পৃথিবীতে আসলাম । দাদী তখন খুশীতে আমার নাম রাখলেন- নূর জাহান। ছোটবেলা রোগাক্রান্ত ছিলাম বলে দাদীজান তাঁর কাছে রক্ষিত পুরানো একটি অচল স্বর্ন মুদ্রা আধা গরম পানিতে ভিজায়ে সেই পানি দ্বারা প্রত্যহ আমাকে গোসল করাতেন। ঐ পুরানো মুদ্রাটি দাদাজান তাকে গিফট্ট করেছিলেন। সোনা ভেজা পানির আঁচড়ে আমি নাকি একদিন সোনারূপ হয়ে গেছি । এটা অবশ্য দাদীর কথা। দাদী তাঁর শেষ

যাত্রার আগে, একদিন সেই অচল সোনার মুদ্রাটি আমার হাতে গুজে দিয়ে বলছিলেন-পূর্ণিমার মাঝ রাতে আধা গরম পানীতে এ সোনার মুদ্রাটি ভিজায়ে তোর মনের মানুষটিকে গোছল করায়ে দিবি। দেখবি, সে তোর সোনার মানুষ হয়ে গেছে। তারপর একদিন সোনালী সকালে দেখবি তোর কোল জুড়ে এসেছে একটি পূর্ণিমার চাঁদ। তার গায়ে মাখা সোনালী পানীর আঁচড়। আমি সেই অচল স্বর্ন মুদ্রাটি তোমাকে দেখাব। মুদ্রাটি প্রতিদিন আমাকে স্বপ্ন দেখায়। আর, তুমি বলেছো, আমার নামে জান আছে? আমিতো এমন কোন দিন ভাবিনি ! তাহলে তো এটা তোমারই আবিস্কার।' বিকেল বিদায় নিত, ছোপ ছোপ অন্ধকার এসে লাগত গাছের পাতায় পাতায়। ওর লজ্জা মাখা মুখ ঝাঁপসা হয়ে আসত। আমরা দাড়াতাম বিদায়ের সুরে। বিজলি বাতি পথ দেখাত ঘরে ফেরার। গুমের দেশে আমি দেখতাম, সোনা পানীতে ভেজা একটি নিস্পাপ শরীর।

ক্যাম্পাসে একদিন আম গাছের নীচে বসেছিলাম। জাহান মাটিতে এঁকে দিল ছোট্ট একটি ঘর। সেখানে কবুতরের মৈথুন। বিলাসী স্বপ্ন চাদর ঘিরল আমাদের চারপাশে। আম মুকুলের মিষ্টি শিশির ঝরল আমাদের গায়ে। একে অপরের দিকে তাকায়ে হাসলাম। ওর সাদা দাঁতের হাসিতে দেখলাম আমার চোখের প্রতিছবি। বলেছিলাম-জান, তুমি আবার হাস তো? আমি আমার চোখ দেখি? ও বলেছিল-এখানে নয়, ছোট্ট ঘরে আয়নার সামনে । তোমার চোখে চেয়ে চেয়ে। চোখেই মানায় চোখের ছবি।

পদ্মা পাড়ে কত বিকাল বসেছি। জেগে উঠা নতুন চড়ের কাশফুলে কত হয়েছি দোলানো বাতাস। দিনের শেষে ,আঁচলে বসন্তের সিক্ত বাতাসের ছোঁয়া মেখে জাহান ফিরে যেত হলের রুমে। সেদিন ছিল ২ রা মার্চ'৭১, মংগল বার। সারা দেশে ফুলে উঠতেছিল গণ আন্দোলনের শিখা। শুরু হোল দেশের সারা শহর ও সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মিছিল। ৩ মার্চ তারিখ রাজশাহীতে মিছিলের উপর গুলি বর্ষন ,কয়েক জনের মৃত্যু,সান্ধ্য আইন জারী,রাত্রে জোহা হলে মিলিটারীর বেড়িকেট ও ছাত্রদের হল ত্যাগের আদেশ। সারাদিন একটা আতংকের ভিতর কাটল। সবাই হল ত্যাগ করার প্রস্তুতি। ইতিমধ্যে আগামী কাল সবাইকে হল ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন কতৃপক্ষ। ক্লাশ বন্ধ ।পরদিন আমি জাহানের সাথে দেখা করলাম। এক সময়ে জাহানের ডান হাতের পাঁচটি আঙ্গুল আমার ডান হাতটি স্পর্শ করল। আমাকে জাহানের এটাই প্রথম ছোঁয়া। কিযেন বলতে গিয়ে চোখের পানিতে থেমে গেল। মুখ ঘুরায়ে চলতে চলতে আবার ফিরে তাকায়ে বলে গেল-সুখে থেকো,আমাদের বিকেল গুলোকে মনে রেখো। ৫ই মার্চ সবাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে যে যার গন্তব্যে চলে এলাম।

মুক্তিযুদ্ধের দিন গুলো কেটেছে এক ভয়ের মাঝে। থাকতে হয়েছে হানাদার বাহিনীর নাগালের বাইরে। গ্রামের বাড়ীতে সবুজ ধানের ক্ষেত, উন্মুক্ত প্রান্তর আর মুক্ত বাতাস সামনে রেখে আমি লিখেছি মুক্তিযুদ্ধের কবিতা ও বিভিন্ন প্রকারের গান। আর লিখেছি প্রতিদিনের ডাইরী। দু এক জনের মুখ বা ছবি মনে ভাসলেও দেশের মায়ায় ওদিকে চোখ ফিরাতে পারিনি। তখন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গানই আমার প্রিয় গান, মুক্তি বাহিনীর বিজয় সংবাদই আমার প্রিয় সংবাদ। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ করলাম। দিন তারিখ ঠিক হোল যুদ্ধে যাবার। বাবা আমাকে এতদিন হানাদার বাহিনী, আল বদর ও আল শামস নামক রাজাকার বাহিনীর হাত

থেকে রক্ষার জন্য সব সময় পাহারা দিচ্ছিলেন। তিনি আমার মতিগতি টের পেয়ে পেলেন। তিনি চাচ্ছিলেন না যে, এই বয়সে এখনি আমি মুক্তি বাহিনীতে যোগ দান করি। ডিসেম্বর '৭১ এর প্রথম সপ্তাহে তিনি তার এক বন্ধুর সাথে আমাকে পাঠালেন দেশের দক্ষিনে বঙ্গোপ সাগর দেখতে। কিন্তু পুরো সাগর দেখা আমার আর হয়নি। এদিকে মুক্তি যুদ্ধের সাথে শুরু হোল পাক -ভারত যুদ্ধ। তাড়াতাড়ি সাগরের বন্ধন থেকে মুক্তি নিয়ে চলে এলাম বাড়ীতে। সেদিন ছিল ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১সাল। গৌরবের দিন, শত্রুর আত্মসমার্পনের দিন, হৃদয় নাচনের দিন। বিজয়ের সংবাদ বলতে বলতে সবাইকে ভরিয়ে দিয়েছি বিজয়ের খেলায়। হাতের মুঠোয় এক টুকরা মাটি তুলে নিজের অজান্তেই আনন্দে বলে ফেললাম -আমি তোমায় বড় ভালোবাসি। চার দিকে তাকিয়ে দেখলাম দেশের মুক্ত আকাশ,ঝরঝরা সবুজ আর মুক্ত বাতাসে ঢেউ খেলানো সোনালি ধানের শীষ। ঐদিন বিকালে বাজারে র পথে পিওন চাচার কাছে শুনলাম আমার নামে একখানা চিঠির কথা। যা কয়েক দিন আগে এসেছে। মনে করেছিলাম হয়তো বন্ধু সবুজের নিয়মিত চিঠি। সন্ধ্যার পর বাড়ীতে চিঠি খানা পেলাম। চিঠি খানা দেখে বুঝতে পারলাম জাহানের চিঠি। অক্টোবর মাসে লেখা। আমি উৎসাহিত হলাম। মূহুর্তের জন্য হারিয়ে গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আম্রকাননে। মনের সেলুলয়েডে ভেসে এল এক সোনারূপ মুখ, একখানা অচল স্বর্ন মুদ্রা ও পাঁচটি আংগুলের কোমল ছোঁয়া। চিঠিতে লেখা ছিলঃ

প্রিয় //////,

জানিনা এ লেখা তোমার কাছে পৌঁছাবে কিনা।তবুও তোমার কথা এত মনে পড়ছে যে না লিখে পারলাম না। বিকালে তোমার কাছে বসলে ভালোবাসার একটা ঘ্রান আমাকে ঘিরে রাখত,আর আমি শিহরিত হতাম উৎসাহী বাতাসে দোলানো বৃক্ষের মত। আম ফুলের শিশিরবৃষ্টি যখন আমাদের স্বপ্নকে মিষ্টি মিশিয়ে দিত, তখন আমি তোমাকে নিয়ে হারিয়ে যেতাম আকাশ নীলের আড়ালে। তোমাকে স্পর্শে লজ্জা আমাকে পরাজিত করত। অপেক্ষার মধুরতায় আজও আমি বেঁচে আছি।তবে জানিনা বিধাতা কেন আশার সাথে এত ভয় মিশিয়ে রেখেছেন?

//

তোমাকে দেখতাম সোনা পানিতে ভেজা একটা সোনার মানুষ। শোন, অনেক সংকটের মাঝেও সেই অচল সোনার মুদ্রাটি আমি ধরে রেখেছি। এবার এটা তোমাকে দিয়ে দেব। আমাদের //////////////////////////। স্বপ্নে কতদিন তোমাকে দেখতে চেয়েছি,কিন্তু একবার ও দেখিনি। আসলে এখন আমার আর সুখের গুম নেই।

এখন আমাদের বড় একটা সুখের সময় নয়। মুক্তি যুদ্ধের প্রথম কিছুদিন ভালোই ছিলাম। দেশ বিভাগের অনেক আগে এদেশে আসলেও আজ এখানে কিছু সুযোগ সন্ধানীরা আমাদেরকে অবাঙ্গালীবলে চিহ্নিত করেছে। আমাদের বাড়িঘরের আসবাব ও দামী জিনিষ পত্র এখন আর নেই। একটা আতংক আমাদের চারদিকে। আমরাও যে একটা সোনার বাংলা চাই।

যদি আর দেখা না হয়,তবে পরপাড়ে /////////

//।
আমার এ লেখা শুধু তোমারই জন্য।
সুখে থেকো,আমাদের বিকেল গুলোকে মনে রেখো।

আমি তোমারই
জান,
১৩ আক্টোবর ১৯৭১।

আসলেই সবসময়ে সব কথা বলা যায় না। লেখাও যায় না।
তা না হলে এ চিঠির সব অংশ আমি লিখতে পারলাম না কেন?
জাহান এর ঐ চিঠি খানা আমার ১৯৭১ এর ডাইরীর ১৬ ই ডিসেম্বর এর পাতায়ে পিন আপ করে রেখেছি। যত দিন যাচ্ছে জাহানের চিঠি খানা আস্তে আস্তে সোনালী আভা ছড়াচ্ছে। প্রতিবার আমার কাছে আসে একটি ভেজা কান্না মিশানো আনন্দের ১৬ ই ডিসেম্বর।
১৯৭২ সালে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সাথে সাথেই আমি সবার আগে হলে যোগদান করলাম। তখনও ভারতের সেনাবাহিনী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থান করতেছিল। হলে জাহান কে খুঁজলাম। ও তখনও আসে নাই।
আমি শান্তাহার গিয়ে ছিলাম। ডিসেম্বরের পহেলা সপ্তাহে মুক্তি বাহিনী ও পাক সেনাদের এক যুদ্ধের সময়ে জাহান দের বাড়ীটি মর্টারের গোলায় আঘাত প্রাপ্ত হয়। জাহান এর এক ভাই ছাড়া ঐ পরিবারের সবাই তখন মারা যায়।
হাসপাতালে জাহান মারা যায় ১৬ ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালের সন্ধ্যার পর।
একজনের নাম ডেকে জাহান মৃত্যুর আগে কি যেন বলতে চেয়েছিল। তবে নার্সরা ঐ নামের তার কোন আত্মীয়কে ওখানে খুঁজে পায়নি।